BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY
DHANBAD, JHARKHAND

SYNOPSIS
OF
THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR Ph.D DEGREE

:TITLE:

KOBI GANESH BASU : JIBON O SAHITYO
(কবি গণেশ বসু : জীবন ও সাহিত্য)

:RESEARCH SCHOLAR:

NIKHIL CHANDRA MAHATO
S/O- SANTOSH KR MAHATO
VILL.- PALASHBANI, P.O.- BARI, P.S.- BORO
DIST.- PURULIA, (W.B.), PIN- 723131

:SUPERVISOR:

Dr. JAYGOPAL MANDAL
ASSTT. PROFESSOR, DEPARTMENT OF BENGALI
B.B.M.K. UNIVERSITY, DHANBAD, JHARKHAND

গবেষণার বিষয় (Objective of Research) :

কবি গণেশ বসু : জীবন ও সাহিত্য

(KOBI GANESH BASU : JIBON O SAHITYO)

গবেষকের নাম (Name of the Research Scholar) :

NIKHIL CHANDRA MAHATO

Signature of the Supervisor **Signature of the Research Scholar**

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Summary of Research Work)

গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি (Research Methodology)

'Research Methodology : Analytical and Descriptive Method'
Tools
1) Data Collection and Analysis
2) Collection from Library
3) Purchased Books
4) Interview with Poet and Contemporary Poets
5) Use of Internet through Computer / smart phone , MS Word

গবেষণার বিষয় (Objective of Research) -

"কবি গণেশ বসু : জীবন ও সাহিত্য"(Kobi Ganesh Basu : Jibon o Sahityo)

অনুমান (Hypothesis) : মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত কবি গণেশ বসু সমসাময়িক খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন ও প্রশাসনের কদর্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অসহায়তা ও ক্ষোভকে রূপায়িত করেন কবিতায়। হয়তো জীবন যন্ত্রণার মুক্তি তাঁর কাব্যপ্রযত্ন।

তাৎপর্য (Significance) : গণেশ বসুর ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনায় স্বাধীনতা পরবর্তী দেশভাগজনিত কারণে ছিন্নমূল মানুষের কান্নাকে উপলব্ধি করা যায়। আর তাঁর কবিতা ষাটের দশক ও তার পরবর্তী উত্তাল ও অস্থির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে তুলে ধরে।

ভূমিকা (Introduction)

প্রথম অধ্যায় (1st Chapter) জীবনের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে কবি গণেশ বসু

দ্বিতীয় অধ্যায় (2nd Chapter) সমকালীন অধ্যায়: যন্ত্রণাদীর্ণ ষাটের দশক

তৃতীয় অধ্যায় (3rd Chapter) গণেশ বসুর কবিতায় কালের পটচিত্র

চতুর্থ অধ্যায় (4th Chapter) গণেশ বসুর কবিতার ভাষাবয়ন ও গড়ন

পঞ্চম অধ্যায় (5th Chapter) প্রাবন্ধিক গণেশ বসু

উপসংহার (Conclusion) Significant of the Title/Subject

তথ্যসূত্র (Reference)

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

ক) আকর গ্রন্থ (Primary Sources)

খ) সহায়ক গ্রন্থ (Secondary Sources)

গ) পত্রপত্রিকা (Journal)

মুখবন্ধ

গণেশ বসুর জন্ম ১৯৪০ সালের ১ ডিসেম্বর, অবিভক্ত বাংলার বরিশালের চাঁদসি গ্রামে। জমিদার পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। নিদারুণ দারিদ্রের মধ্য দিয়ে তার কৈশোর জীবন অতিবাহিত হয়। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউশনে পড়ার সময় থেকেই কবিতা রচনা শুরু করেন। ছাত্র-জীবনেই রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েন। পাশাপাশি জীবিকার জন্য নানা সময়ে নানা ধরনের কাজ করেছেন। সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা করেছেন। পাকাপাকি ভাবে অধ্যাপনা শুরু করেন ১৯৭০ সাল থেকে, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে।

গণেশ বসু ষাটের দশকের কবি। ১৯৬৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের প্রধান অবলম্বন প্রেম, বিরহ, নস্টালজিয়া। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'নিজের মুখোমুখি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। কবির বিখ্যাত কবিতা 'সমুদ্রমহিষ' এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। সমসাময়িক খাদ্য আন্দোলন ও শাষকের নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুবসমাজের অসহায় আর্তনাদ ও ক্ষোভকে রূপায়িত করেছেন এই কবিতায়। নকশাল আন্দোলনের কথা আছে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র'(১৯৬৯)-এ। ১৯৭০-এ প্রকাশিত 'লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা' লেনিনকে নিয়ে লেখা। পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলন ও পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ(১৯৭১)। আদর্শচ্যুত, ভন্ড দেশনেতা তথা শাষকের স্বরূপ উন্মোচন করতে লেখেন- 'বাঘের থাবার নীচে'(১৯৮২) ও 'নীরব সন্ত্রাস' কাব্য। কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি হল- 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন'(২০০৫), 'ভাসান দরিয়া'(২০০৮), 'ভাঙা বইঠার গান'(২০১১), 'বর্ণময় পৃথিবী'(২০১৩), 'বলগা হরিণের শিং'(২০১৫)। এছাড়া তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রবন্ধগ্রন্থ 'নরকরোটিতে প্রজাপতি' প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে।

গণেশ বসুর জীবন যেমন বর্ণময়, তার কবিতার জগত তেমনি বৈচিত্র্যময়। তাঁর জীবনের আলোচনায় দেশভাগের পর ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করা যায়। আর তাঁর কবিতা দেশ ও কালের এক যন্ত্রণাদীর্ণ অধ্যায়কে তুলে ধরে।

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : জীবনের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে কবি গণেশ বসু

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমকালীন অধ্যায় : যন্ত্রণাদীর্ণ ষাটের দশক

তৃতীয় অধ্যায় : গণেশ বসুর কবিতায় কালের পটচিত্র

চতুর্থ অধ্যায় : গণেশ বসুর কবিতার ভাষাবয়ন ও গড়ন

পঞ্চম অধ্যায় : প্রাবন্ধিক গণেশ বসু

উপসংহার

ভূমিকা

বাংলা আধুনিক কবিতার পথচলা শুরু হয় জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবির হাত ধরে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাবনায় তারা আর তৃপ্ত হতে পারছিলেন না। কারণ তাদের মনে হয়েছিল - রবীন্দ্রনাথের "কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রনার চিহ্ন, মনে হল তার জীবন দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।"[১] তাছাড়া "নিজের কথাটা নিজের মতো করে বলবো - এই ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেদিন"। তাই জীবনানন্দ দাশের 'চিত্ররূপময়' কাব্য ভাষা, উপমা প্রয়োগের বিশিষ্টতা বাংলা কবিতার একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিল। রবীন্দ্রনাথের বিদেহী, অতীন্দ্রিয় প্রেমের ধারণাকে ভেঙে শরীরমুখী প্রেমের সঞ্চার ঘটালেন কবি বুদ্ধদেব বসু। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের গুরুর আসনে বসিয়ে সাহিত্য সাধনা শুরু করে দিলেন অনেকে। এলিয়টের অনুসরণে সামাজিক অবক্ষয়, বন্ধ্যা, অন্তঃসারশূন্য জীবনকে রূপায়িত করলেন কবিতায়। মালার্মের বাগ-বৈদগ্ধ, দুর্বোধ্যতারও আশ্রয় নিলেন কেউ কেউ। কাব্যিক শব্দকে পরিহার করে কবিতায় গদ্যের রং ধরানো শুরু হল। চল্লিশ দশকে সাম্যবাদী কবিদের আবির্ভাব ঘটলে বাংলা কাব্য-প্রবাহে একটি নতুন ধারা সংযুক্ত হয়। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এই কবিগোষ্ঠী রোম্যান্টিকতার কল্পনাবিলাস থেকে সরে এসে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন কবিতাকে। সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে রূপ দিলেন কবিতায়। পূর্ণিমার চাঁদ দেখে যাদের সুন্দরী তরুণীর মুখশ্রীর কথা মনে পড়ে না, মনে পড়ে 'ঝলসানো রুটি'র কথা।

পঞ্চাশের দশকে এসে বাংলা কবিতায় আরেকটি নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। পূর্ববর্তী আধুনিক কবিদের সঙ্গে এই দশকের কবিদের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এর কারণ হিসেবে অরুণকুমার সরকার লিখেছেন- "প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির ভিতর দিয়ে আগের যুগের কবিরা যেখানে এসে পৌঁছেছিলেন, কালধর্মে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূলতায় সেখান থেকেই এঁদের যাত্রা শুরু হয়েছে। তাই আধুনিক হবার প্রয়োজনে এঁদের কাউকে নালা-নর্দমায় স্নান করতে হয়নি" ('বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা')। 'আধুনিক হবার প্রয়োজনে' পূর্ববর্তী কবিরা কয়েকটি বিষয়ে সর্বদা সচেতন ছিলেন- প্রথমত: রবীন্দ্র প্রভাব থেকে দূরে থাকা, দ্বিতীয়ত: ভাষা ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরিক্ষা এবং কবিতাকে গদ্যগন্ধী করে তোলা, তৃতীয়ত: সমাজ

মনস্কতা ও কবিতায় রাজনৈতিক উত্তাপ সঞ্চার, চতুর্থত: প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য কবিতার আদর্শকে সামনে রেখে কবিতা রচনা।

কিন্তু পঞ্চাশের দশকের কবিদের রচনায় দেখা গেল- রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁরা বেশি চিন্তিত নন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে একটি মহৎ ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছেন। আবার অগ্রজ কবিদের সাধনাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন বলে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র। কবিতায় গদ্যের রং ধরানোর রীতিকে প্রায় পরিত্যাগ করে নিয়মিত ছন্দ ও মিলের জগতে ফিরে গেছেন তাঁরা। দুর্বোধ্যতাকেও পরিহার করেছেন। চল্লিশ দশকের কবিগোষ্ঠী যে রোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন পঞ্চাশের কবিরা সেই রোম্যান্টিকতাকেই ফিরিয়ে আনলেন (যদিও তা রাবীন্দ্রিক রোম্যান্টিকতা নয়)। রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার আবর্ত থেকে কিছুটা সরে এসে ব্যক্তিমুখিনতা এবং নব্য রোম্যান্টিকতাই গা ভাসিয়েছেন কবিরা।

পঞ্চাশ দশকের এই আপাত নিস্তরঙ্গতা ষাটের দশকে ভেঙে যায় দুটি আন্দোলনের ফলে- হাংরি জেনারেশন ও নকশাল আন্দোলন। প্রথমটি সাহিত্যিক আন্দোলন। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাহিত্য রচিত হয়। অন্যদিকে চল্লিশের বাংলা কবিতায় যে সমাজ-সচেতন ধারার সূত্রপাত হয়েছিল নকশাল আন্দোলনের ফলে তা পুনর্জাগরিত ও সম্প্রসারিত হয়। অবশ্য এই দুটি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হননি ষাটের দশকে এমন কবির সংখ্যাও নগন্য নয়।

এই ষাটের দশকেই কবি হিসেবে গণেশ বসুর আবির্ভাব। বর্ণময় জীবনের অধিকারী কবি জন্মেছিলেন বরিশালের চাঁদসি গ্রামে, জমিদার বাড়িতে। কিন্তু দেশভাগের কারণে মাত্র আট বছর বয়সে চলে আসতে হয় কলকাতায়। শুধু তাই নয়, উদ্বাস্তু হিসেবে নতুন পরিচয়ে পরিচিত হন। অর্ধাহার, অনাহার নিত্যসঙ্গী। কোনো দিন খুদের জাউ জোটে তো কোনো দিন শুধু মুড়ি। লেখাপড়ার পাশাপাশি দিদির সঙ্গে ঠোঙা বানিয়ে দোকানে দোকানে বিক্রি করেন। দাদা বেচতেন চানাচুর। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় মা কখনো প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করেন, কখনো বা কারো বাড়িতে রাঁধুনির কাজ বা কাঁথা সেলাই করে পয়সা উপার্জন করেন। আই.এ. পরীক্ষার ফি দিতে না পারায় আনন্দবাজার পত্রিকায় সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠাতে হয় কবিকে। তবে এই সীমাহীন দারিদ্র তাঁর শিল্পি মনকে আঘাত করতে পারেনি। তাই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউশনে পড়ার সময় থেকেই কবিতা লিখেছেন, অভিনয়ও করেছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন তিনি। চারুচন্দ্র কলেজে পড়ার সময় ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়ী হন। খাদ্য আন্দোলনেও

সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করেন। বামপন্থী আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পার্টির সদস্য হন। আবার সংসারের জোয়াল টানতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে হয় তাকে। মোটর গাড়ি সারাইয়ের কারখানায় কাজ, ড্রাফটসম্যানের চাকুরি, সাংবাদিকতা, অধ্যাপনা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কাজ করেছেন তিনি।

জীবনের মতোই কবি গণেশ বসুর কাব্যজগতও বৈচিত্র্যময়। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েও কবির প্রথম সাহিত্যকর্ম একগুচ্ছ প্রেমের কবিতা। দেশ ও কালের এক সংকটময় মুহুর্তে যখন অন্যান্য কবি সাহিত্যিক সমকালের ছবি আঁকায় ব্যস্ত তখন কবি গণেশ বসু রচনা করেন 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'। যার প্রধান অবলম্বন প্রেম, বিরহ, নস্টালজিয়া। অবশ্য পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'নিজের মুখোমুখি'-তে কবির স্বরূপ অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। সেখানে সমসাময়িক খাদ্য আন্দোলন ও শাষকের নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুবসমাজের অসহায় আর্তনাদ ও ক্ষোভকে রূপায়িত করেন 'শিরাফোলা সমুদ্র মহিষ'[২]এর চিত্রকল্পে। 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র'-এ কবি দেখেন - 'দুরন্ত দৌড়য় ঊনসত্তরের দিনগুলি এগোয় লাশ ঠেলে ঠেলে'[৩]। পরবর্তীকালেও এই ধারাটিকে প্রবহমান রেখেছেন কবি। তাই বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও স্বাধীনতালাভের কথা মাথায় রেখে কখনো কাব্যের নাম দেন 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' কখনো শাসকের অত্যাচারের স্বরূপ তুলে ধরতে লেখেন 'বাঘের থাবার নীচে' বা 'নীরব সন্ত্রাস'-এর মতো কাব্য।

কবি গণেশ বসুর ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনায় যেমন স্বাধীনতা পরবর্তী ছিন্নমূল (দেশভাগজনিত কারণে) মানুষের কান্নাকে উপলব্ধি করা যায় তেমনি তাঁর কবিতা ষাটের দশক ও তার পরবর্তী উত্তাল ও অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে তুলে ধরে। এই কারণেই গণেশ বসুর জীবন ও সাহিত্য- এই দুটো দিকই তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে।

প্রথম অধ্যায় : জীবনের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে কবি গণেশ বসু

বরিশাল জেলার চাঁদসি গ্রাম, সদর থেকে অনেকটা দূরে হলেও বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামেরই বাসিন্দা অন্নদাচরণ বসু মজুমদার। বিশাল দোতলা পাকা বাড়ি তাঁর। সন্তান সন্ততি মোট বারোটি। ছ'টি ছেলে, ছ'টি মেয়ে। পঞ্চম পুত্রের নাম সুমন্তনাথ বসু মজুমদার, প্রজারা ডাকতেন রাঙাবাবু বলে। বরিশালেরই দেহেরগতি গ্রামে বিলাসচন্দ্র দত্তের কন্যা পারুলকে বিবাহ করেন তিনি। সুমন্তনাথ ও পারুলের মোট চারটি সন্তান। দু'টি ছেলে, দুটি মেয়ে। তাঁদের তৃতীয় সন্তান গণেশ বসুর জন্ম ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর, রবিবারে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের অভিশাপ নেমে আসে। ভিটে মাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার মানুষ পূর্ববঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। সুমন্তনাথও স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের নিয়ে বরিশাল ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। তখন গণেশ বসুর বয়স আট বছর। চাঁদসির জমিদার পরিবার কলকাতায় এসে নতুন পরিচয় পেলেন - উদ্বাস্তু, স্মরণার্থী। প্রথমে তারা ওঠেন পদ্মপুকুরের কাছে এক পরিত্যক্ত মিলিটারি ক্যাম্পে। আরো অনেক স্মরণার্থী পরিবারের সঙ্গে শুরু হয় ক্লিষ্ট জীবন যাপন। কিছুদিন পর এই দুঃসহ জীবন যাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে সুমন্তনাথ সপরিবারে আশ্রয় নেন ছোটো বোনের বাড়িতে ভবানীপুরে, ৩ বি. কুন্ডু লেনে। ভবানীপুর নাসিরুদ্দিন স্কুলে কার্তিক ও গণেশ দুই ভাই ভর্তি হন। কিন্তু এরকম আশ্রিত জীবন পারুলের গ্লানিকর মনে হওয়ায় সেখানকার পাট গোটাতে হয়। প্রায় আড়াই বছর তারা সেখানে ছিলেন। এরপর একটা সস্তার ভাড়াবাড়িতে অনেক ভাড়াটের সঙ্গে, নিত্য কলহদীর্ণ পরিবেশে প্রায় একবছর থাকেন। তারপর আশ্রয় নেন চন্দ্রমন্ডল লেনের একটি পরিত্যক্ত আইসক্রিম কারখানায়। এবার কার্তিক ও গণেশ ভর্তি হন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউশনে। রিফিউজি স্টাইপেন্ডেই চলে তাদের লেখাপড়া।

এই সময় ভীষণ আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে তাদের দিন অতিবাহিত হয়। কোনো দিন একবেলা খাবার জোটে তো অন্য বেলা উপোস। কোনো দিন খুদের জাউ খেয়ে থাকতে হয়, কোনো দিন কাটে শুধু মুড়ি চিবিয়ে। এই সীমাহীন দারিদ্র্যের কারণেই একদিন গণেশ বসুর

এক বোন মারা যান। সুমন্তনাথ মাঝে মাঝে দেশে যেতেন এবং সামান্য কিছু খাজনা - টাজনা নিয়ে আসতেন। একসময় তাও বন্ধ হয়। তার উপর তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। স্ত্রী পারুল সংসারের হাল ধরলেন। তিনি কখনো প্লাস্টিক কারখানায় ক্যাজুয়েল কর্মী হিসেবে কাজ করেন। কখনো কারো বাড়িতে রাঁধুনির কাজ বা কাঁথা সেলাই করে পয়সা রোজগার করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি গণেশ বসু দিদির সঙ্গে ঠোঙা বানিয়ে তা দোকানে দোকানে বিক্রি করতেন। দাদা কার্তিক বিক্রি করতেন চানাচুর। পরে অবশ্য তারা টিউশনি করতেন। গণেশ বসু যখন ফাইভ ক্লাসে পড়তেন তখন টু - থ্রির ছেলে মেয়েদের পড়াতেন।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউশনে পড়ার সময় এক বন্ধুর উৎসাহে গণেশ বসু কবিতা লিখতে শুরু করেন, অভিনয়ও করেছেন। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় অম্বিকা চক্রবর্তীর সমর্থনে কচি কাঁচাদের মিছিলে অংশ নেন। বিদ্যালয়ের সিনিয়র ছাত্র অরুণোদয় গুহর ডাকে গণেশ বসু গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জমায়েতে অংশ নেন। ১৯৫৪-র শিক্ষক ধর্মঘট তাঁকে খুব নাড়া দিয়েছিল, মনে প্রশ্ন জেগেছিল মাস্টারমশাইদের মাইনে অত কম হবে কেন?

১৯৫৭-তে গণেশ বসু স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেন। সেই বছরেই তারা চলে যান বাঁশদ্রোণীতে। সেখানে উদ্বাস্তু হিসাবে সরকার তাদের জমি দিয়েছিল। গণেশ বসু কলেজে ভর্তি না হয়ে পড়তে যান আই. টি. আই - টালিগঞ্জে সিভিল ড্রাফটসম্যানশিপ। মাসে চল্লিশ টাকা করে স্টাইপেন্ড পেতেন, আর ছিল টিউশনি। ১৯৫৯-এ আই. টি. আই পাঠ সাঙ্গ করে চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হন স্পেশাল বাংলা নিয়ে। এই সময় তাঁর একাধিক কবিতা 'যুগ ও জীবন' পত্রিকা এবং 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি সরাসরি ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে জয়ীও হন। ১৯৫৯-এর ৩১ আগস্ট খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। পরের দিন রাজ্য জুড়ে পালিত হয় ছাত্র ধর্মঘট। মিছিলে অংশ নিয়ে পুলিশের লাঠির ঘায়ে আহত হন কবি।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আই. এ. পরীক্ষা। কিন্তু একবছরের বেতন বাকি। কতৃপক্ষ জানায় বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দিতে না পারলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। অনোন্যপায় হয়ে গণেশ বসু আনন্দবাজার পত্রিকায় সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠান। ৬-ই জানুয়ারি তা প্রকাশিত হয়। আই. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর তিন মাসের জন্য ক্যালকাটা অটোমোবাইলস নামে এক মোটরগাড়ি সারাইয়ের কারখানায় কাজ নেন। তারপর বাংলায় অনার্স নিয়ে ভর্তি হন চারুচন্দ্র কলেজে। ছাত্র-রাজনীতির চেয়ে এবার তার ঝোঁক বাড়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক

ক্রিয়াকর্মে। দক্ষিণ কলকাতার চারু মার্কেটের কাছে সি. পি. আই.-এর আপিসে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। ১৯৬২-তে পার্টির সদস্য হন।

১৯৬৩-তে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে ড্রাফটসম্যানের চাকুরি নিয়ে চলে যান রাঁচি। কিন্তু সে কাজে মন না বসায় এক মাসের মধ্যেই ফিরে আসেন কলকাতায়, সাউথ সাবার্বান মেন স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। একমাসের মধ্যেই কবি মনীন্দ্র রায় 'অমৃত' (সাপ্তাহিক)-এ সাব এডিটর হিসেবে যোগ দিতে আহ্বান জানালে গণেশ বসু তাতে যোগ দেন। এখানে চাকুরি করতে করতেই বাংলায় এম.এ. পরীক্ষা দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। 'অমৃত'-এ সাংবাদিকতা করতে করতেই তিনি অমৃতবাজার - যুগান্তর - অমৃত এমপ্লয়িজদের ইউনিয়ন গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। হন প্রতিষ্ঠাতা সহ:সম্পাদক। ১৯৬৯-এ তিনি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে যোগ দেন। পাকাপাকিভাবে অধ্যাপনার সুযোগ পান ১৯৭০-এ। একই সঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (WEBCUTA)-র যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই সমিতির নানা সমস্যার সমাধানে ছুটে বেড়িয়েছেন ১৯৯৯ সাল থেকে। এছাড়া বিভিন্ন কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য হয়ে গঠনমূলক কাজ করেছেন। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবেও বঙ্গবাসী মর্নিং, ডে, ইভনিং, নিউ আলিপুর কলেজ প্রভৃতির মতো বহু কলেজে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে পঠন-পাঠনের নানা কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান VDJ- এর আমন্ত্রণে জার্মানিতে যান। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমন করেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নেন। ফিরে এসে আবার অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। অবসর নেন ৩০ নভেম্বর ২০০১-এ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমকালীন অধ্যায় : যন্ত্রণাদীর্ণ ষাটের দশক

মণীন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন - "তিরিশের কবিরা সমবেত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য। সমাজবাদী সাহিত্যাদর্শের বিশ্বাস বা ফ্যাশন যূথবদ্ধ করেছিল চল্লিশের কবিদের। পঞ্চাশের কবিদের ওইরকম উত্তুঙ্গ প্রতিবন্ধক বা বিশেষ সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাস ছিল না - ভাসমান তাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন স্রেফ বন্ধুত্বের টানে, হয়তো সাধারণ্যে লুপ্ত না হওয়ার প্রতিষেধক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এই রাস্তা। 'ষাটে'র এ সব কিছুই ছিল না। তাঁদের সামনে ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শের জোয়ার, বা কোনো গাঢ় বন্ধুতার আহ্বান। বলতে গেলে মোটামুটি স্বাভাবিক, ঘরোয়া, মধ্যপন্থী মানুষদেরই সমবায় এই 'ষাটে'র দশক।[৪]"

এই কারণেই কোনো একটি সূত্র ধরে ষাটের কবিদের সাধারণীকরণ করা যায় না। তবে এই দশকে ঘটে যাওয়া কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক কবিই সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। ষাট দশকের শুরুর দিকেই হয় খাদ্য আন্দোলন। বহু কবি-সাহিত্যিক এই আন্দোলনে যোগ দেন, শাসকের নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তারা। এই সময় মলয় রায়চৌধুরি সম্পাদিত 'হাংরি জেনারেশন'-এর মধ্য দিয়ে একটি সাহিত্যিক আন্দোলনেরও আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথম দিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো শক্তিশালী কবিও এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। মলয় রায়চৌধুরির 'প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার', উৎপলকুমার বসুর 'পোপের সমাধি', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সীমান্ত প্রস্তাব : মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আবেদন', বিনয় মজুমদারের 'একটি উজ্জ্বল মাছ', ত্রিদিব মিত্রের 'হত্যাকান্ড', সমীর রায়চৌধুরির 'হনির জন্মদিন', ফাল্গুনী রায়ের 'মানুষের সঙ্গে কোন বিরোধ নেই', দেবী রায়ের 'উন্মাদ শহর', সুবিমল বসাকের 'হাবিজাবি', অরুণেশ ঘোষের 'এক রাত্রির আকাশ' প্রভৃতি কবিতা এই ভাবধারায় রচিত। এই কবিতাগুলির প্রধান বিশেষত্ব হল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা। বাংলা সাহিত্যের স্থিতাবস্থা ভাঙাই এর লক্ষ্য। তাই কবিতার মধ্যে দেখা যায় ভঙ্গুর বাক-প্রতিমার প্রয়োগ। অর্থাৎ কবিতায় একটি ছবি সম্পূর্ণ গড়ে ওঠার আগেই তা মিলিয়ে গিয়ে আর একটি ছবি ভেসে ওঠে। এছাড়া যৌনচিত্রকল্প, অশ্লীল শব্দ, গালমন্দ, নিম্নশ্রেণীর অবিভক্তি যা পাঁচের দশক পর্যন্ত কবিতায় নিষিদ্ধ ছিল তার যথেচ্ছ প্রয়োগের সূত্রপাত করে গেছেন হাংরি আন্দোলনকারীরা।

হাংরি কবিদের এই যথেচ্ছাচারকে মেনে নিতে না পেরেই বোধহয় ষাট দশকের অধিকাংশ কবি এই পথে বাড়াননি। এই দশকের কবিদের একটি বড় অংশ তাত্ত্বিকতা বা

দার্শনিকতাপ্রবন। কোনো বিশেষ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দিকেই তাদের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, সামসুল হক, বিজয়া মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবি এই শ্রেণির। রত্নেশ্বর হাজরা লিখেছেন -

"গভীর অর্থে কোনো কিছুই চিরায়ত নয়
না সত্যরা না মিথ্যারা-
এমনকি ব্রহ্মের বোধ, লোকায়ত ধ্যান।
গভীর অর্থে কোনো মানুষ
সুখেও নেই, দুঃখেও নেই..."[৫]

কখনো কখনো সেই দার্শনিকতার ঝোঁকে আপ্তবাক্য উচ্চারণের নেশায় মেতে উঠেছেন কবি। যেমন-

১)'বয়স বাড়ে মানে বয়স কমে যায়'[৬]
২)'জানতে যে চায় তার কোনো কিছু কোথাও থামে না'[৬]
৩)'তুমি আর কিছু নও নিজেকে যা গড়ো তুমি তাই-'[৬]

ষাটের দশকের শেষার্ধে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়। এক ঝাঁক তরুণ তরুণী নতুনভাবে দেশগড়ার স্বপ্ন নিয়ে তাতে যোগদান করে। কিন্তু শাসক তাদের কণ্ঠরোধ করতে হত্যালীলায় মেতে ওঠে। এর প্রতিবাদে অনেক কবিই সেদিন কলম ধরেছিলেন। মণিভূষণ ভট্টাচার্য গদ্য-কবিতায়, কাহিনির ফ্রেমে নকশাল আন্দোলনের ছবিকে মূর্ত করে তুলেছিলেন- "...পাশের ফ্ল্যাট থেকে যে দুটো ছেলেকে মাঝরাতে বিছানা থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে-হিঁচড়ে ভ্যানে তুলে খালের ধারে নামিয়ে গুলি করা হয়েছে- তাদের পোড়ানোর গন্ধ ভেসে আসছে, বরং ধূপকাঠিগুলো নিবিয়ে দিন।"[৭]

চল্লিশ দশকে সাম্যবাদী ভাবধারাকে সামনে রেখে কবিতা রচনার যে প্রচলন হয়েছিল ষাটের দশকে এসে তা আরো পরিপুষ্ট হয়। কবি দেবদাস আচার্য লেখেন-

"আমার বাবা সেলাইকল চালাতেন
এবং তার ঘাম দিয়ে ভিজিয়ে দিতেন আমাদের রুটি
সেই রুটি খেয়ে আমার এই স্পর্ধা
যা সব কুলি-কামিনদেরই থাকে।"[৮]

বিদ্রোহী, তাত্ত্বিক, বৈপ্লবিক কবিগোষ্ঠী ছাড়া ষাটের দশকে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রাণবন্ত ধারা ছিল। এরা কবিতা রচনা করেছিলেন জীবনেরই প্ররোচনায়, জীবনেরই উদবেলতায়

এবং জীবনেরই পক্ষাঘাতে। এরা অনেকটা আত্মজৈবনিক। কেননা তারা জীবনের তিক্ততা, অকিঞ্চিৎকরতা, তীব্রতা, বিষণ্নতা, কারুণ্য, সৌন্দর্য ও সুদূরতায় আচ্ছন্ন ও মুগ্ধ হয়ে কবিতা রচনা করেছেন। ভাস্কর চক্রবর্তী, শামশের আনোয়ার, বেলাল চৌধুরি, তুষার রায়, অরুণেশ ঘোষ, দেবারতি মিত্র প্রমুখের মতো কবি গণেশ বসুও এই ধারার কবি। গণেশ বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৬২-তে কবি কমিউনিস্ট ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে কবির মার্কসীয় চিন্তা ভাবনার কোনো ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা এখানে কবি প্রেমের আর্তিতে মুখর। প্রেম ও তারপর বিচ্ছেদজনিত স্মৃতিচারণ এর মূল বিষয় বস্তু। বনানীকে অবলম্বন করে কবি বর্তমানের দ্বন্দ্বমুখর, সংকটময় কালকে উপেক্ষা করেছেন, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের কথা। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নিজের মুখোমুখি'-তে কবি আলোর প্রত্যাশী-

" ... দুর্মর
এ জীবনে আলো চাই,(তুমি
সেই আলো) স্নিগ্ধ পটভূমি।"[৯]

'সোনালী গির্জার মোরগচূড়া'-ও সেই আলো এবং স্নিগ্ধ পটভূমিরই প্রতীক। তবে কবির আক্ষেপ - কোনো দিন সেখানে পৌঁছানো যাবে না। কেননা - "সেই মোরগচূড়ায় কেউ পৌঁছতে পারে না।"[১০] আলোর প্রত্যাশার পাশাপাশি সমকালীন খাদ্য আন্দোলন ও শাসকের অত্যাচারে মানুষের অসহায় আর্তনাদ ও ক্ষোভকে তুলে ধরেন 'সমুদ্রমহিষ' কবিতায়। অর্থাৎ কাব্যের নাম 'নিজের মুখোমুখি' হলেও, নিজের থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতাও দেখা যায় এখানে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে যা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র'-এ প্রতিবাদী কন্ঠের বলিষ্ঠ প্রকাশ - "ধমনী নিদ্রিত সিংহ ফুঁসে ওঠে রৌদ্রের কেশরে।"[১১] এরপর আর পিছন ফিরে তাকাননি কবি, প্রতিবাদী কন্ঠ এবং মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লিখে গেছেন একের পর এক কাব্য - 'লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা', 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ', 'বাঘের থাবার নীচে', 'নীরব সন্ত্রাস', 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন', 'বলগা হরিণের সিং' প্রভৃতি।

তৃতীয় অধ্যায় : গণেশ বসুর কবিতায় কালের পটচিত্র

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউশনে পড়ার সময় থেকেই কবিতা রচনা শুরু করলেও গণেশ বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি যখন এই কাব্য রচনা করেন তখন সমকালের ছবি আঁকার দুরন্ত প্রবণতা কবিদের মধ্যে। গণেশ বসু নিজেও যুগের একজন উৎসুক দর্শক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি লিখলেন প্রেমের কবিতা। কারণ কবির অন্তর-সত্ত্বা তখন প্রেমের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ খুঁজছে। বোঝা যায় এই কবি কৃত্রিম অনুভবে কবিতা লেখেন না অথবা প্রচলিতের স্রোতে গা ভাসাতেও চান না। যা ভেতর থেকে আসে তাকেই কবিতায় রূপ দেন।

গণেশ বসুর 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' কাব্যটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কাব্যের কথা। শুধু নামকরণগত সাদৃশ্যই নয়, 'হাজার বছর ধরে পথ' হেঁটে ক্লান্ত কবি দু'দন্ড শান্তি পেয়েছিলেন বনলতা সেনের সান্নিধ্যে, অনুরূপভাবে গণেশ বসুও বর্তমানের কুরুক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যেন সুদূর তেপান্তরে পৌঁছে যান বনানীর স্মৃতিকে অবলম্বন করে। বনানী হয়তো উপলক্ষ মাত্র, কবির আসল অন্বিষ্ট বিশুদ্ধ ভালোবাসা। যে ভালোবাসার জন্য জগতের সকল পাওয়াকে তুচ্ছ করা যায় -

"ভালোবাসা পেলে আর সম্রাটের কে চাহে গরিমা?
কুবেরের আম্রকুঞ্জ - রাজ্যপাট - সম্মান - ইত্যাদি
অথবা প্রভূত যশ, কবিখ্যাতি বিষাদ প্রতিমা
কিছুই চাহি না আমি। রচে যাবো বিষণ্ণ সমাধি
পবিত্র শিল্পের বুকে যদি পাই ঘৃণিত শোণিতে
শুদ্ধতম ভালোবাসা কোনদিন।"[১২] (১২নং কবিতা)

পক্ষান্তরে - "ভালোবাসাহীন হয়ে বেঁচে থাকা মস্ত অভিশাপ"[১৩]

পরবর্তী কাব্য 'নিজের মুখোমুখি'(১৯৬৭খ্রি)-তে কবির পদচারণা জীবনের বিচিত্র এবং বিস্তারিত ক্ষেত্রে। সমসাময়িক খাদ্য আন্দোলন এবং প্রশাসনের কদর্য নিপীড়ন কবিকে একই সাথে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই ক্ষোভ শুধু তার একার নয়, বরং সমস্ত যুব-সম্প্রদায়ের। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই বিপর্যয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে কবি মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন জীবনের এক উত্তাল তরঙ্গকে। সমকালের এই নিষ্ফল ক্রোধ, ক্ষোভ ও অস্থিরতাকে কবি রূপায়িত করেছেন সমুদ্রমহিষের রূপকে -

"মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাফোলা সমুদ্র মহিষ
আমার ভেতর বুকে ফসফরাস
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফারণ ঘটে যায় যেন
আকাশ পাতাল জুড়ে, চুল ছেঁড়ে, বাহুর পারদে
ভয়ঙ্কর অস্থিরতা বিধ্বস্ত চোয়াল"[১৪] ('সমুদ্রমহিষ')

'রক্তের ভিতরে রৌদ্র'(১৯৬৯ খ্রি) কবির একটি ব্যতিক্রমী মেজাজকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে। গণেশ বসু যখন এই কাব্য রচনা করেন ততদিনে শুরু হয়ে গেছে নকশাল আন্দোলন। একদল তরতাজা তরুণ, রক্তের বিনিময়ে সমাজ বদলের প্রতিজ্ঞায় মরিয়া। তাদের 'রক্তের ভিতরে স্বপ্ন, হাজার হাজার স্বপ্ন'[১৫] তারা 'অভিমন্যু'। অর্থাৎ অভিমন্যুর মতোই তারা চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে জানে, ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেই। তবুও কবির সহানুভূতি তাদেরই প্রতি। এজন্য 'আমার অনুজ' বলে তাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। আর সাহসের সঙ্গে সেই রাজনৈতিক ঘূর্ণিতে অংশ নিয়ে শাসকের জল্লাদবৃত্তিকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে -

"সময়ের বুকে কিছু হাড়গোড়, ঝাঁকে ঝাঁকে বোম পড়ে, তৃতীয় পুরুষ উঠে আসে,
হিংসার জবাবে হিংসা, মধ্যবিত্ত ত্রস্ত মেঘ উঁকি মারে লাশ ঠেলে ঠেলে।...
দুরন্ত দৌড়য় ঊনসত্তরের দিনগুলি, লাশ ঠেলে ঠেলে
এক একটা স্ফুলিঙ্গ দেখি ছবি হ'য়ে বসে থাকে কবন্ধের ঘাড়ে।"[১৬] ('ছবি')

গণেশ বসুর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'লেনিন- অধিকার রক্তের কবিতা', প্রকাশিত হয় ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে। এখানে সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছেন লেনিন -

"মিছিলে মিছিলে আলোড়ন অবিরাম
রক্তে লেনিন আনে স্বপ্নের দিন
বোধের গভীরে অনন্ত ক্রেমলিন
যৌবনলাল হৃদয়ে একটি নাম
লেনিন লেনিন শাশ্বত সংগ্রাম।"[১৭]

'বাঘের থাবার নীচে' প্রকাশিত হয় ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে। এর কিছুকাল পূর্বে গণসংগ্রাম, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রশাসনিক ক্ষমতার শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ মানুষের জন্য নতুন সূর্য ওঠেনি, তাদের বহু আকাঙ্খিত সুদিন আসেনি। বরং এক অনিবার্য ক্ষয় হিংস্র বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছিল। ষাট ও সত্তর দশকের দিনগুলিতে হিংসা, দ্বেষ,

ক্ষুধা, অত্যাচার, নিপীড়নের জমাট অন্ধকার ছিল কিন্তু সেখানে একটি ইতিবাচক সংঘবদ্ধ আন্দোলন ছিল যা মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল। কিন্তু আজ সেই সংঘবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরেছে, ভেঙে গেছে মানুষের স্বপ্ন। মানুষ বুঝতে পেরেছে -

"খোলসই বদলায় শুধু, মরা মেঘে দিন ভাসে, সযত্নে সাজায়
ভাঙাচোরা ঠ্যাং সব, নামেরই বদল শুধু, দেখি
টিকটিকির ঠোঁটে রক্ত, আরশোলার তোবড়ানো শরীর।
এখন সমস্ত স্বপ্ন হা হা করে মরচে পড়া লোহার মতই।"[১৮]

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে গণেশ বসুর অত্যন্ত পরিণত মানসিকতার ছাপ নিয়ে জন্ম নিয়েছিল 'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যটি। জীবন অভিজ্ঞ কবি দেখেন আজ গোটা দেশ নীরব সন্ত্রাসে আক্রান্ত। এ সন্ত্রাস শিরায় শিরায়, পরতে পরতে ঘুন-ধরানো এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে সঞ্চারিত। হারিয়ে গেছে মানবিকতা, মানুষের মন হয়ে গেছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। প্রাণের সজীবতা, সরসতা কোথাও নেই, যেন - 'গোটা দেশ ডুবে যায় মর্গের ভিতরে'[১৯]। জীবনের এই বিশুষ্ক ছবি ধরা পড়েছে সুদীর্ঘ 'খরা' কবিতায়।

২০০৫-এ প্রকাশিত হয় গণেশ বসুর অষ্টম কাব্যগ্রন্থ 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন'। একজন শিল্পীর কাছে আদর্শ বা তত্ত্বের চেয়ে মানুষ ও মানবিকতা যে অনেক বড় তার প্রমান গণেশ বসুর এই 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন' কাব্য। কবির রাজনৈতিক বিশ্বাস যা-ই থাকুক না কেন দলীয় রাজনীতির অপরিসর, সংকীর্ণ দমবন্ধ করা আদর্শে তিনি নিজের কবিতাকে বেঁধে ফেলেননি। তিনি দলকে পেরিয়ে দেখেছেন মানুষকে। সেই মানুষের যন্ত্রণা বারবার তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাই একসময় মানুষকে সংগ্রামী বোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি, তার বর্তমান স্বৈরাচার গণেশ বসুকে নীরব করতে পারেনি। বরং তিনি স্বপ্ন ভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণা এবং বিক্ষোভে উচ্চারণ করেছেন -

"তোমার শিকড়ে ছিলো প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, আবেগের পানি
তোমার শিকড়ে ছিলো স্বাধীনতা, আরিঅন, সৃষ্টির আগুন...
পানি নেই -। ক্লেদ বমি যমপট। তিলে তিলে অহংকার ফোটে
উনুন কি নিভে গেছে? অবিশ্বাস্য অপমৃত্যু। ধূলোঝড় ওঠে।"[২০](পন্থা)

গণেশ বসুর 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন', 'ভাসানদরিয়া'(২০০৮), 'ভাঙা বইঠার গান'(২০১১) পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার এক বিরাট ক্যানভাস হয়ে উঠেছে। ঊনিশশো ঊনষাট থেকে দু'হাজার এগারো - সুদীর্ঘ পাঁচটি দশক ধরে শাসনতন্ত্রের একটি চেহারাকেই কবি

প্রত্যক্ষ করেছেন। লাইসেন্সপ্রাপ্ত সন্ত্রাসকারীদের নিয়ে রাষ্ট্র, বিক্ষুব্ধ মানুষের কণ্ঠরোধ করে চলেছে। পুলিশ - মিলিটারিই হল মানুষের কণ্ঠরোধ করার হাতিয়ার - এই কথাটি নানাভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কবি -

"পুলিশ পুলিশই থাকে, শাসকেরও একই রঙ, সূর্য ডোবে পায়ের তলায়।"[২১] ('হাত')

অথবা,

"পীড়িত আত্মায় জ্বলে প্রতিশোধ যৌবনের ক্ষিপ্ত তরবারি
গণহত্যা করা ছাড়া পুলিশের কোনো কাজ কখনো কি ছিল?"[২২] ('জঙ্গলমহল)

কবি গণেশ বসুর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তিনি সারাজীবন ধরে মেরুদণ্ড সোজা রেখে চলেছেন। কখনো কোনো অন্যায়ের সাথে আপোস করেননি। ক্ষমতার কাছে বা প্রলোভনের কাছে বিকিয়ে দেননি নিজেকে। নিজে মার্কসীয় দর্শণের প্রতি গভীর আস্থাশীল হওয়া সত্ত্বেও বামপন্থী সরকারেরও সমালোচনা করতে পিছুপা হননি। আসলে গণেশ বসুর কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানুষ। মানুষের প্রতি অন্যায়, অবমাননা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি। এইসবের বিরুদ্ধে তার লেখনি সর্বদায় গর্জে উঠেছে এবং আজও উঠছে। ২০১৯-এর পূজো সংখ্যায় প্রকাশিত 'ক্ষমতাই শেষ কথা নয়' বা 'মানবতা অদ্ভুত নীরব'-এর মতো কবিতাই তার প্রমান। জাতীয়তাবাদের আড়ালে মানবতার অপমৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে কবি লেখেন -

"মানবতা অদ্ভুত নীরব,
রক্তে ভাসে শিশুদের শব,
এর নাম রাষ্ট্রধর্ম বুঝি?
মর্টারে অভিযানে জাতীয়তা স্মরণীয় পুঁজি!...
মানুষ নিখোঁজ হয়, ছররা চলে মাত্রাহীনতায়।
রাত্রি জুড়ে শুধু আর্তস্বর
আপেলের বনে বনে মৃত্যুর খবর।"[২৩]

চতুর্থ অধ্যায় : গণেশ বসুর কবিতার ভাষাবয়ন ও গড়ন

কবিতার আত্মা যদি হয় তার ভাব, তাহলে তার ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দচয়ন, পংক্তি বিন্যাস - এগুলো হল এক একটি অঙ্গ, যাদের সুসমন্বয়ে গড়ে ওঠে কবিতার শরীর। একজন কবি লিখতে লিখতে যখন ক্রম-পরিণতির দিকে এগোন তখন ভাবের সাথে সাথে কাব্য-শরীরেরও নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেন। কবিতার শরীর নিয়ে চলতে থাকে পরীক্ষা নিরিক্ষা। আমাদের আলোচ্য গণেশ বসুর কবিতার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' হল গণেশ বসুর প্রেমের কবিতার সংকলন। এখানে মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দের সুরেলা তান ও অন্তমিলের মাধুর্য প্রেমানুভূতি প্রকাশে সহায়ক হয়েছে -

"অনিন্দ্য শিল্পের খোঁজ যদি পাই এইখানে বলিব তাহারে
কিছুই চাহি না আমি, চাহি শুধু ভালোবাসা, বনানী তোমারে"[২৪]

প্রেমিকার চোখের উপমা যে পদ্ম, হরিণের চোখ, খঞ্জন এসব না হয়ে 'পাখির নীড়' হতে পারে তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। এর মাধ্যমে তিনি অলঙ্কার প্রয়োগের গতানুগতিক রীতিটির মূলে কুঠারাঘাত করেন। যার প্রভাব পড়ে সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের সমস্ত কবির ওপর। গণেশ বসুও শশাফুল, কাশফুল, নিশিন্দা পাতা, আকন্দ, ভাঁট, অতসী, অপরাজিতাকে কবি-প্রেমিকার চোখ ও প্রেমের অনুসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো পংক্তি তো স্পষ্টই জীবনানন্দীয় ঘরানার। যেমন -

"জলজ গুল্মের ঘ্রাণ নিয়ে জেগে থাকো, জাগো, জাগে
নিশিন্দা পাতার চোখ পাকা কামরাঙার শরীর..."[২৫]

জীবনানন্দের মতোই সাধু ও চলিত ভাষার শব্দকে কবিতায় পাশাপাশি ঠাঁই দেন কবি -

"বাস্তুচ্যুত হতে ফের ভুলেও **চাহি** না আমি, **চাই**
দীপাবলি হয়ে ওঠে, আমৃত্যু তোমারই গান গাই।"[২৬]

কোনো অনুভূতিকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্য একই শব্দের পুনরাবৃত্তি গণেশ বসুর কাব্যশৈলীর একটি বিশিষ্ট দিক। যেমন -

"এখন কি হাহাকার? সারাদিন ব্যর্থ যায়, যায়, যায়, যায়।
তবু স্মৃতি হয়ে যাবে, অধরাই থেকে যাবে অলীক সুন্দর? "[২৭]

এখানে গতানুগতিক ব্যর্থতার একঘেয়েমিকে প্রকাশ করতে কবি 'যায়' শব্দটির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন।

'নিজের মুখোমুখি'-তে গণেশ বসু ব্যবহার করলেন নির্দিষ্ট নিয়মনীতিহীন গদ্য ছন্দ। কবিতার শরীর থেকে মুছে গেল অন্তমিলের প্রযত্নও। এমনকি অনেক কবিতায় বাক্যের গঠন পর্যন্ত বিস্রস্ত, এলোমেলো। যেমন -

"তখন নিজেকে বড়ো অপরাধ, ছত্রীসেনা নেমে পড়ে কোনো
পর্দার আড়ালে বুঝি সুবিধাদানের
ভূমিকায়, পরস্পর বিপ্রতীপ কোণে
সব চেনা মুখে তাই ধ্বংসের থাবার
ছুটে চলে..." [২৮]('সমুদ্রমহিষ')

'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ', 'নীরব সন্ত্রাস', 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন'-এ কবি কবিতার ফর্ম নিয়ে বেশি পরীক্ষা নিরিক্ষা করেছেন। যেমন -

'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যের 'আবিষ্কার' কবিতা -

"একটি শহরতলির ছবি (সবে বৃষ্টি হয়ে গেছে)
৩ মেঘ মারলো উঁকি ঈশান কোণে
১ মাছ ভর্তি পুকুর ডাইনে
পুকুর পারে মাঠ, মাঠের শেষে বাড়ি
১ মানুষ (কাঁচের জানলায় জ্বলছে চোখ)"[২৯]

'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন'-এর 'বেঁচে আছি' কবিতা -

"বিশ্বায়ন মায়াময় TCDD
ভূতের পাহারা
গ-এর নাড়ি কেটে আগেই বেরোয় ঘ
ঘ-এর নাড়ি ছিঁড়ে দাপিয়ে বেড়ায় ঙ
চ
ছ
জ
ঝ
ঞ
উদ্ভট সময় জুড়ে ছ্যাঁচর প্রতিভা।"[৩০]

সচেতন শিল্পী সর্বদায় প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। শব্দের প্রচলিত অর্থকে ভেঙে নতুন চিত্রকল্প নির্মাণ করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন স্বতন্ত্র দৃশ্যপট। ফলে আমাদের চারপাশের পরিচিত জগত থেকে উপাদান নিলেও কবির নির্মাণ শৈলীতে তা অনন্য হয়ে ওঠে। যেমন -

১) "আকাশের দিকে তাকাতেই সামনের মাঠে **হাঁপিয়ে ওঠা ন্যাড়া গাছটায়** বসন্ত এলো।"[৩১]
('শূন্যতার পাশাপাশি' / 'নিজের মুখোমুখি')

২) "পায়ে পায়ে ভুবনডাঙায় / **শিক কাবাবের লালে মা আমার।**"[৩২] ('অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' / 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ')

৩) "**কুমিরের লেজের মতো জীবন ভর /** ক্লান্তিকর সন্ধ্যা।"[৩৩]
('বাঘের থাবার নীচে' / 'বাঘের থাবার নীচে')

৪) "কিছু কিছু **প্রশ্নচিহ্ন** ঝুলেছিল **বিষপোকা আমার শরীর।**"[৩৪]
('তোমার মুখের দিকে ' / 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন')

৫) "সংবাদ পত্রই আমি পড়ে যাই দ্রৌপদীর শাড়ির মতন"[৩৫]
('তাকানো তার মধ্য দিয়ে' / 'ভাসানদরিয়া')

শব্দ ব্যবহারেও কবির স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। সব ধরনের শব্দই তিনি কবিতায় ব্যবহার করেছেন। গণেশ বসুর শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে পবিত্র মুখোপাধ্যায় বলেন - "সম্ভবত গণেশ বসুই প্রথম তরুণ কবি যাঁর রচনায় বৈজ্ঞানিক নানা পরিভাষা চিত্রকল্পের রূপ নিয়ে ফিরে ফিরে আসে।"[৩৬] তিনি 'প্রিপেট', 'ক্রোমোটোগ্রাফি', 'হাইটেনশান', 'বুলডোজার', 'ক্রেন', 'মণিস্ক্রীন', 'DNA', 'RNA', 'ব্লাডপ্রেশার', 'ওয়াক্সবাথ' প্রভৃতি শব্দকে অনায়াসেই ব্যবহার করেন কবিতায়।

এইভাবে ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দচয়ন, চিত্রকল্প নির্মাণ প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে চলেছেন কবি।

পঞ্চম অধ্যায় : প্রাবন্ধিক গণেশ বসু

গণেশ বসু কবি হিসেবেই অধিক পরিচিত। আর কবিখ্যাতির আড়ালে কিছুটা চাপা পড়ে গেছে তাঁর প্রাবন্ধিক পরিচয়টি। তিনি নিজেও হয়তো কবি-সত্ত্বাটিকেই প্রধান বিবেচনা করেন। তাই ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যেভাবে পর্যায়ক্রমে তিনি আমাদের কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়েছেন সেই তুলনায় প্রবন্ধগ্রন্থ কম। তবে যে প্রবন্ধগুলি তিনি রচনা করেছেন তাতে তার চিন্তাভাবনার মৌলিকতা ও গভীরতা, জ্ঞানের ব্যাপ্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজে কবি এই জন্যই বোধহয় তার প্রবন্ধেরও প্রধান বিষয় হিসেবে গ্রহন করেছেন কবিতাকে। সেই আলোচনায় কবি ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক মন্দাক্রান্তা সেন অনেকের কবিতায় স্থান পেয়েছে। তবে শুধুই কবিতা নয় সাহিত্যের অন্য বিষয় নিয়েও আলোচনা আছে, যেমন বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় শিশু কিশোর সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা স্থান পেয়েছে গণেশ বসুর একটি প্রবন্ধে। এই বিষয় নিয়ে বহু লেখকের বহু প্রবন্ধ থাকলেও গণেশ বসু এখানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছেন। 'শিশুতীর্থ' কবিতার সূচনা 'The Child' দিয়ে তিনি আলোচনা শুরু করেছেন। সেখানে তিনি পাঠকের কাছে এই সত্য উন্মোচন করেছেন - "রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রথম জীবন থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত এই যিশুই তাঁকে মানবশিশুর মহিমায় অভিষিক্ত করেছে।"[৩৭]

প্রসঙ্গক্রমে তিনি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট শিশুর সাথে নজরুলের শিশু কিশোরের তুলনা করেছেন। সেখানে তাঁর অভিমত হল রবীন্দ্রনাথের শিশু কিশোর নগরের এবং অনেক বেশি শিষ্ট। কিন্তু নজরুলের শিশু গ্রামীন জীবনের ও অতি সাধারণ। এর কারণ হিসেবে প্রাবন্ধিক বলেছেন - "একদা লেটোর দলে গান লিখিয়ে কবি নজরুল সহজ গ্রামীণ রুচিকে স্পর্শ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায় ছিলেন শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারের। এক অর্থে অতি সাধারণ জীবন থেকে বিযুক্ত। এঁরা এক নতুন বাঙালি জীবন সৃষ্টি করে গেছেন।... ল্যাং এর মতো শব্দ বা 'লিচু-চোর'- এর মতো দুরন্ত বালকের ছবি রবীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়-এ মিলবে না। এরা অনেক বেশি নাগরিক(আরবান) ও শিষ্ট (সফিসটিকেটেড)।"[৩৮]

প্রাবন্ধিকের মতে রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী'-র কবিতায় শিশু ও কিশোর-মনে জীবন আদর্শের বীজমন্ত্র দান করেন। কিন্তু নজরুল দেন সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানবতার মন্ত্র - 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।'

ঈশ্বর গুপ্তকে নিয়ে আলোচনায় ঈশ্বর গুপ্তের স্ববিরোধিতাগুলির কারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পাতায় তার অনেক প্রগতিবাদী মতামত প্রকাশ পেলেও, অনেক কবিতায় তিনি স্ত্রী-শিক্ষা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। এর কারণ হিসেবে গণেশ বসু ঈশ্বর গুপ্তের 'সাংবাদিম্মন্যতা'কে দায়ী করেছেন এবং বলেছেন যে স্ববিরোধিতাগুলিকে তাৎক্ষনিকতার দাবি দিয়ে দেখলে অনেকটা বোঝা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের অন্তরের টান প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি, তাই কবিওয়ালাদের জীবনী সর্বসমক্ষে আনেন, ভারতচন্দ্রকে নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ রচনা করেন। আবার নতুনকে স্বাগত জানাতেও দ্বিধা করেন না।

জীবনানন্দ দাশের 'বেলা অবেলা কালবেলা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার সমগ্র কবিতা সম্পর্কেই তথ্য সমৃদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেন। তরুণ সান্যালের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সহ সমকালীন যুগ পরিবেশ এবং সেই প্রেক্ষাপটে তার কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া 'বিষ্ণু দে'র কবিতায় মিথ' এবং 'মিথ ও বাংলা কবিতা' নামক দুটি প্রবন্ধও গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

প্রত্যেক কবির একটি নির্দিষ্ট দর্শণ থাকে। সেই দর্শণ গড়ে ওঠে কবির জীবনাভিজ্ঞতা ও সমকালীন যুগ-পরিবেশের উপর ভিত্তি করে। মহর্ষি-পিতার সান্নিধ্য ও জমিদারি-সচ্ছলতায় বেড়ে উঠেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দরূপমমৃতম যদবিভাতি' অর্থাৎ যা কিছু প্রতিভাত হচ্ছে সবই অমৃত আনন্দ রূপ - উপনিষদের এই বাণীকে জীবনের মূলমন্ত্র করে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে রচিত অজস্র সাহিত্যে এই মন্ত্রের প্রতিফলন আমরা দেখেছি। কিন্তু ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায় লালিত তরুণ কবিরা উক্ত মন্ত্রে আস্থা রাখতে পারেননি বলেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হয়ে কবিতা রচনা করতে প্রয়াসী হন।

ষাটের দশকে আবির্ভূত কবি গণেশ বসু মার্কসীয় দর্শণের প্রতি আকৃষ্ট হন প্রধানত দু'টি কারণে -

প্রথমত : তিনি শৈশবে দেশভাগজনিত কারণে ছিন্নমূল হয়ে এসে উঠেছিলেন এদেশে। উদ্বাস্তু হিসেবে বহু দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের দিন অতিবাহিত হয়েছিল। মাথা গোঁজার জন্য নিজেদের একটি বাড়ি থাকা তো দূরের কথা, অনেকদিন তাদের অর্ধাহারে অনাহারে কাটাতে হয়। এই অবস্থায় সাম্যবাদী মার্কসীয় দর্শণ কবিকে ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত : চল্লিশ দশকে বাংলা কবিতায় একটি সমাজ-সচেতন ধারার সূত্রপাত হয়। মার্কসীয় ভাবধারায় প্রভাবিত এইসব কবিরা সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকে নিয়ে আসেন কবিতায়। কবিতাকে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে শোষিত, নিপীড়িত, মানুষদের সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা বলেন। ষাট দশকের শেষদিকে নকশাল আন্দোলন শুরু হলে বাংলা কবিতার এই ধারাটি আরো পরিপুষ্ট হয়। গণেশ বসুর আবির্ভাব যেহেতু ষাট দশকে, তাই তিনিও সহজেই এই ধারার প্রতি আকৃষ্ট হন।

সেক্ষেত্রে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ দু'টিকে বলা যায় প্রস্তুতি পর্ব। কেননা 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'-এ মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন নেই। 'নিজের মুখোমুখি'-তে প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও শাসকের স্বৈরাচারী মনোভাবের জন্য কবির মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় যা 'সমুদ্রমহিষ' কবিতায় পরিস্ফুট। পাশাপাশি এই কাব্যে প্রেমের কবিতাও স্থান পেয়েছে। এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' থেকে কবির মার্কসীয় ভাবনার যথার্থ আত্ম-প্রকাশ ঘটে। চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা' তো শুধু লেনিনকে

নিয়েই লেখা। পাশাপাশি মানুষের প্রতি অবমাননা, অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধেও তাঁর লেখনি গর্জে ওঠে।

এক সময় বামপন্থী দল ক্ষমতায় আসে। কিন্তু জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে তাদের অনীহা দেখে কবির স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়। ফলে রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে কবি সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে রচনা করেন 'বাঘের থাবার নীচে' বা 'নীরব সন্ত্রাস'-এর মতো কাব্য। এরকম সাহসিকতার পরিচয় তিনি পরেও বার বার দিয়েছেন। এমনকি আজ পর্যন্ত তাঁর নির্ভীক লেখনী অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র

১)বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', 'সাহিত্যচর্চা' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা - ১১১

২)গণেশ বসু, 'সমুদ্রমহিষ', 'নিজের মুখোমুখি', বীক্ষণ প্রকাশ ভবন, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা - ৬২

৩)গণেশ বসু, 'ছবি', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', অনুভব প্রকাশনী, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা - ৯১

৪)অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, পৃষ্ঠা - ১৮৫

৫)অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, পৃষ্ঠা - ১৮৭

৬)অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, পৃষ্ঠা - ১৮৭

৭)অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, পৃষ্ঠা - ১৯১

৮)অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, পৃষ্ঠা - ১৯২

৯)গণেশ বসু, 'তুমি', 'নিজের মুখোমুখি', বীক্ষণ প্রকাশ ভবন,১৯৬৭, পৃষ্ঠা - ৪৯

১০)গণেশ বসু, 'সোনালী গির্জার মোরগচূড়া', 'নিজের মুখোমুখি', বীক্ষণ প্রকাশ ভবন,১৯৬৭, পৃষ্ঠা - ৩৫

১১)গণেশ বসু, 'সিংহ', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' অনুভব প্রকাশনী, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা - ৭৪

১২)গণেশ বসু, ১২ নং কবিতা, 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ', কবিপত্র, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা - ১৮
১৩)গণেশ বসু, ৩৫ নং কবিতা, 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ', কবিপত্র,১৯৬৪, পৃষ্ঠা - ৩১
১৪)গণেশ বসু, 'সমুদ্রমহিষ', 'নিজের মুখোমুখি', বীক্ষণ প্রকাশ ভবন, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা - ৬২
১৫)গণেশ বসু, 'রক্তের ভিতরে স্বপ্ন', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', অনুভব প্রকাশনী, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা - ৯১
১৬)গণেশ বসু, 'ছবি', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', অনুভব প্রকাশনী,১৯৬৯, পৃষ্ঠা - ৯১
১৭)গণেশ বসু, 'লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা', সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৭০, পৃষ্ঠা - ১১৭
১৮)গণেশ বসু, 'এখন', 'বাঘের থাবার নিচে', মডেল পাবলিশিং হাউস,১৯৮২, পৃষ্ঠা - ১৮২
১৯)গণেশ বসু, 'খরা', 'নীরব সন্ত্রাস', শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ২৫৩
২০) ড. জয়গোপাল মন্ডল (সম্পাদিত) 'গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা - ২৩৩,২৩৪
২১) ড. জয়গোপাল মন্ডল (সম্পাদিত) 'গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা - ৩৩১
২২) ড. জয়গোপাল মন্ডল (সম্পাদিত) 'গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা- ৩৭০
২৩)'নবপর্যায়' (পত্রিকা), শারদীয় ২০১৯
২৪)গণেশ বসু, ৮ নং কবিতা, 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ', কবিপত্র, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা - ১৫
২৫)গণেশ বসু, ৩৪ নং কবিতা, 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ', কবিপত্র,১৯৬৪, পৃষ্ঠা - ৩০
২৬)গণেশ বসু, ৩৭ নং কবিতা, 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ', কবিপত্র, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা - ৩২
২৭)গণেশ বসু, ২ নং কবিতা, 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ', 'কবিপত্র', ১৯৬৪, পৃষ্ঠা - ১৩
২৮)গণেশ বসু, 'সমুদ্রমহিষ', 'নিজের মুখোমুখি', বীক্ষণ প্রকাশ ভবন, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা - ৬২
২৯)গণেশ বসু, 'আবিষ্কার', 'নীরব সন্ত্রাস', শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ২২০
৩০) ড. জয়গোপাল মন্ডল (সম্পাদিত) 'গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা - ২৭৯
৩১)গণেশ বসু, 'শূন্যতার পাশাপাশি', 'নিজের মুখোমুখি', বীক্ষণ প্রকাশ ভবন, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা - ৫০
৩২)গণেশ বসু, 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ', 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ', সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৭১, পৃষ্ঠা - ১৫১

৩৩)গণেশ বসু, 'বাঘের থাবার নিচে', 'বাঘের থাবার নিচে', মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২, পৃষ্ঠা - ১৬১

৩৪) ড. জয়গোপাল মন্ডল (সম্পাদিত) 'গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা - ২৫৬

৩৫) ড. জয়গোপাল মন্ডল (সম্পাদিত) 'গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা - ৩০৭

৩৬) 'অহর্নিশ' (পত্রিকা),সম্পাদক - শুভাশিস চক্রবর্তী বর্ষ- ১৯, সংকলন- ২৪, মে-২০১৫, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা।

৩৭) গণেশ বসু, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শিশু', 'নরকরোটিতে প্রজাপতি', মনন প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ৪৯

৩৮)গণেশ বসু, 'শিশু সাহিত্যে নজরুল', 'নরকরোটিতে প্রজাপতি', মনন প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ৬৭

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ

১) গণেশ বসু, 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ, কবিপত্র, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৪

২) গণেশ বসু, 'নিজের মুখোমুখি', বীক্ষণ প্রকাশ ভবন, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৬৭

৩) গণেশ বসু, 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' অনুভব প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯

৪) গণেশ বসু, 'লেনিন- অধিকার রক্তের কবিতা' সীমান্ত প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৭০

৫) গণেশ বসু, 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' সীমান্ত প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৭১

৬) গণেশ বসু, 'বাঘের থাবার নীচে ', মডেল পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮২

৭) গণেশ বসু, 'নীরব সন্ত্রাস ', শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯

৮) গণেশ বসু, 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন ', বসুধারা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫

৯) গণেশ বসু, 'ভাসান দরিয়া', বসুধারা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৮

১০) গণেশ বসু, 'ভাঙা বইঠার গান', মনন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১

১১) গণেশ বসু, 'নরকরোটিতে প্রজাপতি ', মনন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১১

১২) গণেশ বসু, 'বর্ণময় পৃথিবী' মনন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৩

১৩) গণেশ বসু, 'বলগা হরিণের শিং ', কবিতা সীমান্ত, প্রথম প্রকাশ ২০১৫

সহায়ক গ্রন্থ

১) অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১১

২) উত্তম দাশ (সম্পাদিত) 'বিশ্ব বাংলা কবিতা', মহাদিগন্ত, পদ্মপুকুর রোড, বারুইপুর, জানুয়ারি ২০১৩

৩) গৈরিকা ঘোষ, 'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতা', পুস্তক বিপনি, জানুয়ারি ২০০৫

৪) ছন্দা রায় ও তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) 'প্রসঙ্গ হাজার বছরের বাংলা কবিতা', প্রকাশক অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৩/০৮/২০০১

৫) ফাল্গুনী ঘোষ, 'জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কবিতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', দি সী বুক এজেন্সি, কলকাতা, জুলাই ২০১৭

৬) বুদ্ধদেব বসু, 'সাহিত্যচর্চা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৫৪

৭) রাহুল পুরকায়স্থ (সম্পাদিত), 'বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা', ধানসিঁড়ি, জানুয়ারি ২০১৭

৮) লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, 'স্মৃতির দর্পণে', সমীর পুস্তকালয়, অক্টোবর ২০১৮

পত্র পত্রিকা

১) 'অহর্নিশ', বর্ষ ১৯, সংকলন ২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২, মে ২০১৫

২) 'সময় তোমাকে' উৎসব সংখ্যা ২০১০

৩) ত্রৈমাসিক অক্ষর পঞ্চম বর্ষপূর্তি সংকলন, জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০০২

৪) 'চান্দ্রমাস', মে - নভেম্বর ২০০২

৫) 'এবং মুশায়েরা', শারদীয় ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

৬) 'নবপর্যায়', শারদীয় ২০১৯

৭) 'নতুন পথ এই সময়', শারদীয় ২০১৯

৮) 'কবিতা কলকাতা', শারদীয় ২০১৯

৯) 'শারদীয় কালান্তর' - ১৪২৬

১০) 'শারদ নন্দন' - ২০১৯